ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 151-163
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.019

জহির রায়হানের গল্প: রাজনৈতিক চেতনার বিপ্রতীপে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বিবর্ণ দিনলিপি

ড. প্রতাপ ব্যাপারী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, শালবনি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 18.10.2024; Accepted: 26.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstract

In the cultural landscape of Bangladesh, Zahir Raihan stands as a prominent figure. Though widely known as a successful filmmaker, his contributions transcend cinema, extending profoundly into literature. In post-1947 East Bengal, then East Pakistan, Raihan distinguished himself by not merely limiting his creativity to writing; he actively experimented with themes and narrative styles. His first and only published collection of short stories, 'Surya Grahan', vividly portrays the social, cultural, and historical depths of Bangladesh. His works capture the essence of rural life, the historical significance of the Language Movement, and the harrowing struggles of the 1971 Liberation War. Through Raihan's unique artistic lens, he portrayed the lives in remote Bengali villages alongside the poignant narratives of the freedom struggle, effectively uncovering layers of social injustice and humanity's disregard within each storyline.

Keywords: Language Movement, Liberation War, Class Disparity, Plight of Women, Religious Superstition, Crisis of the Middle Class, Social Injustice.

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে জহির রায়হান একজন প্রতিষ্ঠিত নক্ষত্র। একজন সফল চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও রায়হানের খ্যাতি কেবল চিত্র পরিচালনার সীমিত পরিসরেই আবদ্ধ থাকেনি, কথাসাহিত্যের বিস্তৃর্ণ পরিসরেও ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৪৭-পরবর্তী পূর্ব-বাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের কথাসাহিত্যের ধারায় জহির রায়হান স্বতন্ত্র এই কারণে যে, কেবল লেখালেখির মধ্যেই তাঁর কর্মপ্রবাহকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তাঁর সৃজনকর্মের বিষয় ও প্রকরণ নিয়ে তিনি রীতিমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এর পেছনে রয়েছে তাঁর পরিচালক-সত্তা। অন্যান্য কথাশিল্পীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানেই যে, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকে তিনি কেবল জীবনশিল্পীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেননি, একইসঙ্গে চিত্রশিল্পীর মতো ক্যামেরা দিয়ে লেন্সবন্দিও করেছেন। ফলে স্থান-কাল-চরিত্রের জটিল ঘূর্ণাবর্ত কেবল মুদ্রিত আকারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেলুলয়েডের পর্দায় সজীব রক্ত-মাংসের চরিত্র হিসেবেও উপস্থাপিত হয়েছে। কোথাও যেন কারুশিল্পী আর কথাশিল্পী রায়হান একাত্ম হয়ে গেছেন।

জহির রায়হানের জন্ম ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালি জেলার মজুপুর গ্রামে। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। ডাকনাম ছিল জাফর। মার্কসবাদী পার্টির নেতা মণিসিংহ তাঁর নাম দিয়েছিলেন রায়হান। সবমিলিয়ে নাম হয় জহির রায়হান। কমিউনিজমের ছোঁয়াতেই তাঁর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। পিতা কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকার কারণে রায়হানের স্কুল-শিক্ষা

জীবনের প্রথমপর্ব অতিবাহিত হয়েছে রাজনৈতিক শ্লোগানমুখর নাগরিক কলতানের মধ্যে। অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার ছিল রায়হানের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু। এ-প্রসঙ্গে রায়হানের আরেক ভাই শাহরিয়ার কবির স্মৃতিচারণায় জানাচ্ছেন—

> ''চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি জহির রায়হান যখন স্কুলের নীচের ক্লাশের ছাত্র, তখন অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রভাবে তিনি রাজনীতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। শহীদুল্লাহ কায়সার তখন কোলকাতার একজন ছাত্রনেতা। প্রকাশ্যে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে এবং গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। জহির রায়হান তখন পার্টি-কুরিয়ার ছিলেন। পার্টির আত্মগোপনকারী সদস্যদের মধ্যে চিঠিপত্র ও খবর আদান প্রদানের কাজ করতেন। প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'স্বাধীনতা' বিক্রি করতেন। সেই আমলের একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জহির রায়হান সম্পর্কে বলেছেন, 'তখন ও ভালোভাবে হাফপ্যান্টও পরতে জানতো না। প্রায় বোতাম থাকতো না বলে একহাতে ঢোলা হাফপ্যান্ট কোমরের সাথে ধরে রাখতো। রায়হান ছিল ওর 'টেকনেম'— পার্টি পরিচয়ের ছদ্মনাম (তার পিতৃদত্ত নাম জহিরউল্লাহ)। বড়ভাইর প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলো।''[১]

রায়হানের বয়স যখন মাত্র দশ বছর, তখন তিনি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পাশাপাশি 'ভিয়েতনাম দিবসে'র মিছিলেও যোগদান করেছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতির হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গেই রায়হানের লেখালেখির সূত্রপাত। সাবলীল বাংলা লেখার গুণ তিনি আয়ত্ত করেছিলেন সহজাতভাবেই। মাত্র বারো বছর বয়সেই রায়হান এক বৃহন্নলাকে কেন্দ্র করে লেখেন 'ইন্দ্রাণী' নামের একটি গল্প। এরপর 'মালবিকা' নামের একটি গল্প। কোনোটিই মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু লেখালেখির সূচনাকালে গল্পের বিষয় নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই রায়হানের স্বকীয়তা টের পাওয়া যায়। গতানুগতিক বাল্যের রোমাঞ্চমুখর রঙিন পরিবেশে রায়হান বড়ো হননি, তিনি বেড়ে উঠেছেন রাজনীতির রাজপথে ইস্তেহার হাতে। সেকারণে ছাত্রাবস্থা থেকেই পরিণত জীবনবোধ তাঁর চেতনাকে যেমন ঋদ্ধ করেছে, তেমনি চরিত্রে এনেছে দৃঢ়তা।

জহির রায়হানের প্রথম এবং একমাত্র প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' (১৯৫৫)। ১৯৭৯ সালে সন্ধানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় 'জহির রায়হানের গল্পসমগ্র'। এখানে মোট উনিশটি গল্প স্থান পেয়েছে। এই উনিশটি গল্পই ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে ড. আশরাফ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় আহমদ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত 'জহির রায়হান রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গল্পগুলোতে বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, এবং ইতিহাসের গভীর প্রেক্ষাপট এক অনন্য শিল্পরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। রায়হানের লেখায় মুখ্য হয়ে উঠেছে গ্রামবাংলার চিরায়ত জীবনের একান্ত ছবি, ভাষা-আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত পথচলা। তাঁর শিল্পীসত্তা বাংলার নিভৃত গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে মুক্তিসংগ্রামের মর্মস্পর্শী আখ্যানকে এমনভাবে তুলে ধরেছে যে, তাতে সামাজিক অবিচার এবং মানবতার প্রতি অবজ্ঞার প্রতিটি স্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নাগরিক ব্যস্ততার মাঝে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং সামাজিক সংকটের এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি 'হারানো বলয়' গল্পটি। দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র, আলম এবং আরজু, তাদের ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতিচারণের ভেতর দিয়েই গল্পের বিস্তৃত কাহিনি রচনা করেছেন গল্পকার। এই কাহিনিতে প্রেম একটি পটভূমি মাত্র; আসল উপজীব্য হলো সমাজের বিবেকহীনতা, নির্দয়তা এবং কঠোর আর্থিক সংকট। মধ্যবিত্ত কেরানী আলম এবং তার একসময়ের প্রেমিকা আরজু— দু'জনেরই জীবনে অনেক কিছু বদলে গেছে। গল্পের শুরুতে দেখা যায়, প্রায় দুই বছর পর তাদের পুনরায় দেখা হয় শহরের এক ফুটপাতে। কলেজে তারা ছিল অন্তরঙ্গ, কিন্তু অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে তাদের সম্পর্ক পূর্ণতা পায়নি। আলম জানতে পারে যে আরজুর পরিবারের

অবস্থা শোচনীয়— তার বাবা মারা গেছেন, দাদা জেলে, বোন ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং বাড়িতে আরও ছোট ভাইবোন এবং বৃদ্ধা মা আছেন, যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আরজুর কাঁধে। কিন্তু আলম নিজেও এতটাই সংকটে যে, কোনো সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। গল্পকার, তাঁর সূক্ষ্ম বর্ণনায়, আলমের জীবনের যে কঠোর বাস্তবতার চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা শুধু আলমের নয়, পুরো সমাজেরই একটি প্রতিচ্ছবি। ক্যান্সার আক্রান্ত ছোটবোনের মৃত্যুর পর কবর থেকে ফেরার সময় পুনরায় আলমের সঙ্গে দেখা হয় আরজুর। এক শোকগ্রস্ত এবং বিধ্বস্ত আরজুকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করলেন গল্পকার—

> ''মাটির দিকে চুপ করে চেয়ে রইলো আরজু। তারপর এক সময় মুখ তুললো আলমের দিকে— কেন কাঁপছি জানো? দুটো দিন, এক মুঠো ভাতও খেতে পাইনি আমি, শুধু আমি নই— আমার ছোট ছোট ভাইবোন, আমার বুড়ো মা কেউ খায়নি। সবাই উপোস।''[২]

আরজুর এই সংলাপে ফুটে ওঠে জীবনের বঞ্চনা, আর্থিক দুর্দশা এবং অক্ষমতার চূড়ান্ত প্রকাশ। গল্পের অন্যতম মর্মান্তিক দৃশ্য হলো আলমের ভেতরকার স্বার্থপরতার ঝলক। যদিও আলম আরজুর প্রতি গভীর প্রেম অনুভব করে, কিন্তু তার নিজের সংকট তাকে সংবেদনশীলতার এক ভিন্ন পথে পরিচালিত করে। বেতনের টাকা হাতে পেলেও আলমের মনে আসে দেনাপাওনার ভাবনা এবং যদি আরজু টাকা ধার চায়, তাহলে কীভাবে সে এড়িয়ে যাবে— এই চিন্তা। এই সংকটময় মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে হঠাৎই আরজুর সঙ্গে তার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। আলম এবার জানতে পারে যে আরজু নিষিদ্ধ প্রচারপত্র বিলি করার অপরাধে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। গল্পকারের বর্ণনায় সেই করুণ দৃশ্যটি এক বেদনা উদ্রেককারী মুহূর্ত তৈরি করেছে—

> ''বৈকালীন সূর্যের রক্তিম আভা তির্যকভাবে গড়িয়ে পড়েছে আরজুর হাতের হাতকড়াটার ওপর— আর কেমন চক্‌চক্ করছে ওটা। যেন ওর হারানো বালা দুটো।''[৩]

এই বাক্যটি শুধু আরজুর জীবনের ট্র্যাজেডির রূপায়ণই নয়, বরং তার ব্যর্থ স্বপ্নগুলোরও প্রতীকী ইঙ্গিত বহন করে। গল্পের নামকরণেও রয়েছে এক গভীর ব্যঞ্জনা। কলেজ জীবনে স্কলারশিপের টাকায় আরজু কিনেছিল একজোড়া বালা। আলম নিজ হাতে আরজুকে বালা পরিয়ে দিয়েছিল। এই বালাজোড়া ছিল তাদের প্রেমের প্রতীক। আরজু সেই বালার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বলেছিল—

> ''যদি কোনোদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় কিংবা যদি আমরা অন্ধকারে ডুবে যাই, এই বালা আলোর সৃষ্টি করে পথ দেখাবে।''[৪]

কিন্তু আরজুর সেই আশা পূর্ণতা পায়নি। সমাজের কঠোর বাস্তবতা, আর্থিক সংকট এবং সম্পর্কের ভাঙন, সবকিছুই সেই বালাকে হারিয়ে দেয়। আর আজ, সেই বালা নতুনভাবে ফিরে এসেছে— পুলিশি হাতকড়া হয়ে। একসময় যে বালা আরজুর ভালোবাসার প্রতীক ছিল, তা আজ তার বন্দিত্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ গল্পের মাধ্যমে লেখক সমাজের কঠোর নির্মমতা এবং মানুষের ব্যক্তিগত সংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পের শেষাংশে যখন আলমের চোখে আরজুর বন্দিত্বের দৃশ্য ভেসে ওঠে, তখন আলমের মনে পড়ে আরজুর সেই কথাগুলো—

> ''ওর বালা অন্ধকারে পথ দেখায়।''[৫]

কিন্তু বাস্তবে সেই বালা আজ আর কোনো আলো দেয় না, বরং আরজুকে ঠেলে দিয়েছে আরও গভীর অন্ধকারের দিকে। প্রেম, সম্পর্ক এবং আর্থিক দুরবস্থার সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছে 'হারানো বলয়' গল্পটি।

গ্রামীণ শিক্ষার দুরবস্থা, রাষ্ট্রের উদাসীনতা এবং গ্রামের মানুষের সংকল্পের এক অনবদ্য চিত্র ফুটে উঠেছে 'নয়া পত্তন' গল্পে। এখানে শিক্ষার জন্য যে সংগ্রাম, তা এক মানবিক বিপ্লবের রূপ ধারণ করে।

গল্পের শুরুতে আমরা দেখি, গ্রামের স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শিক্ষক শনু পণ্ডিত শহরে ছুটে যান, শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে। আশায় বুক বাঁধা শনু পণ্ডিত যখন শুনলেন যে শহুরে বাবুদের বিলাসবহুল হোটেল এবং ইংরেজি স্কুল বানাতেই ফান্ড ফুরিয়ে গেছে, তখন তিনি হতবাক। শিক্ষার মতো একটি মৌলিক অধিকার শহরের উচ্চবিত্তদের স্বার্থে বলি হতে দেখলেন তিনি। সেই দৃশ্যের বর্ণনায় গল্পকার বলেছেন—

> ''শিক্ষা বিভাগের বড় সাহেব শমসের খান বললেন, রাজধানীতে দুটো নতুন হোটেল তুলে, আর সাহেবদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ইংলিশ স্কুল দিতে গিয়ে প্রায় কুড়ি লাখ টাকার মতো খরচ। ফান্ডে এখন আধলা পয়সা নেই সাহেব।''[৬]

এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমাজের বৈষম্য— শহরের জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা আর গ্রামের জন্য একরাশ বঞ্চনা। এত কিছুর পরেও শনু পণ্ডিত হাল ছাড়েননি। তিনি গ্রামের জমিদার জুলু চৌধুরীর কাছে গেলেন, কারণ সেই পঁচিশ বছর আগে এই চৌধুরীই স্কুলের জন্য সামান্য কিছু অর্থ ও জমি দান করেছিলেন। কিন্তু আজকের চৌধুরী আর আগের মতো নেই। দান-অনুদানের চিন্তা মাথায় এলেই যেন আঁতকে ওঠেন তিনি। তার কাছে স্কুলের জন্য টাকা চাওয়া যেন এক অপমানের বিষয়। গল্পকারের কথায়—

> ''সাহায্যের নামে রীতিমতো আঁতকে উঠলেন জুলু চৌধুরী। বললেন, পাগল, টাকা পয়সার কথা মুখেও এনো না কখনো। ...আধলা পয়সা নেই হাতে।''[৭]

রাষ্ট্রের ঔদাসীন্যের সঙ্গে চৌধুরীর এই স্বার্থপরতার মেলবন্ধনে গড়ে উঠলো গ্রামীণ শিক্ষার বিরুদ্ধে এক অদৃশ্য দেয়াল। জোড়া প্রত্যাখ্যান এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে 'ভোরের ট্রেনে গাঁয়ে ফিরে এলেন শনু পণ্ডিত'। তাঁর আশা ছিল সরকার বা জুলু চৌধুরী— কেউ একজন হয়তো সাহায্য করবে, কিন্তু হতাশা ছাড়া কিছু পেলেন না। গ্রামের মানুষগুলো তাঁর কাছে আশায় বুক বেঁধেছিল— তারা ভেবেছিল শহরের বাবুরা বা চৌধুরীরা তাদের স্কুল বাঁচাবে। কিন্তু শনু পণ্ডিতের ব্যর্থতা দেখে তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। কিন্তু গল্পকার হতাশার মধ্যেই গল্প শেষ করেননি। বরং গ্রামের মানুষের ঐক্য এবং লড়াইকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন বৃদ্ধ হাশমত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে—

> ''হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললো, যতসব ইয়ে আইছে— যাও ইস্কুল আমরাই দিমু। কারো পরোয়া করি না। না গরমেন্টো— না চৌধুরী, বলে কোমরে গামছা আঁটলো হাশমত।''[৮]

এই কথার মধ্যে রয়েছে গ্রামের মানুষের সাহসিকতা এবং লড়াই করার শক্তি। হাশমতের নেতৃত্বে গ্রামের মানুষজন নিজেদের হাতেই স্কুল গড়তে লেগে যায়— কেউ দেয় খড়, কেউ বাঁশ, কেউ দেয় শ্রম। সবার অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাহায্যেই গড়ে ওঠে গ্রামের নতুন স্কুল। নতুন স্কুলের নতুন নামকরণের মধ্যে দিয়ে কেবল গ্রামীণ মানুষের একতা নয়, হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্যপূর্ণ চিত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন গল্পকার—

> ''কালো চারকোণী ফলকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে একখানা দা দিয়ে ঘষে ঘষে চৌধুরীর নামটা তুলে ফেললো তোরাব আলী। তারপর বুড়ো হাশমতের কল্কে থেকে একটা কাঠ কয়লা তুলে নিয়ে অপটু হাতে কি যেন লিখলো সে ফলকটার ওপর। ...শনু পণ্ডিতের ইসকুল।''[৯]

এই স্কুল সরকার বা চৌধুরীদের দয়াদাক্ষিণ্য নয় শনু পণ্ডিতের অদম্য ইচ্ছা আর গ্রামের নিরক্ষর মুসলমান মানুষগুলোর হার না মানা মানসিকতার দৃষ্টান্ত। হাশমত আর তোরাব আলীদের লড়াইয়ের ফলেই পতন ঘটলো সরকার এবং চৌধুরীদের আস্ফালন আর ঔদ্ধত্যের। পত্তন হলো নতুন স্কুল— শনু পণ্ডিতের স্কুল।

নগর জীবনের সংকটময় পরিস্থিতিকে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'ভাঙাচোরা' গল্পে। গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে এক দম্পতি, যারা সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরবর্তী ধাক্কায় তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে নতুন বাস্তবতায় স্থিতি খোঁজার চেষ্টা করছে। দেশ বিভাগের আগে কলকাতায় তারা ছিল স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার। কিন্তু দেশান্তরিত হয়ে ঢাকায় এসে তাদের স্বপ্নভঙ্গের করুণ রূপকথার মতো নতুন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই নতুন জীবনে স্বচ্ছলতার পরিবর্তে তারা পাচ্ছে আর্থিক সংকট এবং অসহায়ত্ব। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র টুনু এবং তার স্বামী, যে এখন কুলিগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। টুনু, সংসার চালানোর তাগিদে, একা ঝিয়ের কাজ করে, কিন্তু এই কঠিন বাস্তবতা তাদের দুজনের মধ্যে কোনোদিন আলোচনার বিষয় হয়নি। কারণ, তাদের মধ্যে রয়েছে এক গভীর মানসিক সংকট—তারা নিজেদের কর্ম বা জীবন সংগ্রামের কথা একে অপরের কাছে প্রকাশ করতে চায় না, নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য। টুনু সালামকে স্বামীর সম্পর্কে বলেছে—

> ''পিয়নের কাজ করলে কি হবে। লোকটার প্রেসটিজ জ্ঞান বড় টনটনে খবরদার। আমি যে মেসের ভাত পাক করে দিই, ঘুনাক্ষরেও এ কথাটা বলো না ওকে। তাহলে রেগে আগুন হয়ে যাবে। টুনুর কণ্ঠে অনুবোধের সুর।''[১০]

আবার টুনুর অবর্তমানে তার রিক্সা চালক স্বামী নিজের অবস্থার কথা জানিয়েছেন গল্পের কথক সালামকে—

> ''মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংসার চলে না। তাতো বোঝেনই। অফিস ছুটির পর অগত্যাই তাই রাতে রিক্সা চালাই। ...ও কথাটা বলবেন না টুনুকে। প্রেসটিজ জ্ঞান বড় টনটনে ওর। জানতে পারলে কেলেঙ্কারি কিছু একটা ঘটিয়ে বসবে।''[১১]

টুনুর স্বামী, রিক্সা চালানোর কথা লুকিয়ে রাখলেও, নিজের সঙ্কটের কথা কাহিনির কথক সালামের কাছে প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে, টুনু নিজের কাজ নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখতে চেয়েছেন স্বামীর কাছে। এই গল্পের মধ্য দিয়ে জহির রায়হান মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের আত্মসম্মানের দ্বন্দ্ব, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং জীবনের করুণ বাস্তবতাকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। এই গল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে আত্মসম্মানবোধ এবং নিজেদের সংকটকে অস্বীকার করার প্রবণতা, সেটাই 'ভাঙাচোরা' নামের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা। 'ভাঙাচোরা' একটি প্রতীকী নাম, যা দম্পতির ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন এবং সাংসারিক জীবনের টানাপোড়েনকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ঢাকা শহরের সংকটময় সময়কে কেন্দ্র করে রচিত 'জন্মান্তর' গল্পটি। লেখক এই গল্পে যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ, শহুরে জীবনের অসহায়তা এবং একজন সাধারণ মানুষের আত্মপরিচয় ও মানবিকতার পুনরুজ্জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মন্তু, যে একসময় কৃষিভিত্তিক স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিল, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। মন্তুর শহরে আগমন এবং পকেটমারের কাজে জড়িয়ে পড়া, তার নতুন জীবনের এক কঠোর বাস্তবতা। শহরে পাড়ি জমানোর পর সে টিকে থাকার সংগ্রামে নিজেকে জড়ায় চুরির কাজে। তবে এই চুরি শুধুমাত্র তার জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল না, বরং একটি অন্ধকারময় জীবনযাপনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিন সে পকেট মারতে গিয়ে পায় একটি সোনার আংটি। এই আংটি পেয়ে সে নতুন করে স্বপ্ন দেখে, সেই স্বপ্নে ছিল পরীবানুকে বিয়ে করার ইচ্ছা। আংটি যেন তার নতুন জীবনের এক রঙিন স্বপ্ন হয়ে উঠেছিল। গল্পের মোড় ঘোরে এক রাতে, যখন সে আংটি পকেটে নিয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়। বৃষ্টির রাতে এক কেরানির সঙ্গে তার দেখা হয়, যে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। কেরানির সংসারের

করুণ দশা, তার পরিবারের কঙ্কালসার চেহারা মন্তুর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেরানির বাড়িতে গিয়ে মন্তু যখন তার পরিবারের দুর্দশা দেখে, তখন তার ভেতরে এক অদ্ভুত মানসিক পরিবর্তন শুরু হয়। রাতে শুয়ে থাকার সময় সে পঞ্চাশ টাকা চুরি করার পরিকল্পনা করে, কিন্তু হঠাৎই সে একটি বাচ্চা মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, যে অভুক্ত অবস্থায় বলছিল—

> ''মাগো, হাঁড়িতে কি একটাও ভাত নেই। পেটটা যে পুড়ে গেলো।''[১২]

এই কথাগুলো তার হৃদয়কে বিদ্ধ করে। সে উপলব্ধি করে, কেরানির পুরো পরিবার না খেয়ে দিন পার করছে, আর সেই শিশুর কান্না তার চেতনায় গভীরভাবে আঘাত হানে। বাচ্চার কান্না মন্তুর মানবিকতা জাগিয়ে তোলে, তার ভেতরে এক নতুন মানুষ জন্ম নেয়। ঠিক তখনই সে সিদ্ধান্ত নেয়, পঞ্চাশ টাকা চুরি না করে, নিজের চুরি করা সোনার আংটিটি কেরানির শার্টের বুকপকেটে রেখে দেবে। এই মুহূর্তটি গল্পের মূল বার্তা প্রকাশ করে— মানুষের জীবনে একটি সময় আসে, যখন সে নিজের মানসিকতার পরিবর্তন উপলব্ধি করে, এবং সঠিক পথে ফিরে আসে। গল্পের শেষে, মন্তু সেই আংটিটি কেরানির পকেটে রেখে বেরিয়ে আসে। আকাশে চাঁদ উদ্ভাসিত, বৃষ্টিও থেমে গেছে। এটি যেন মন্তুর মনের কালো মেঘ সরে গিয়ে নতুন এক আলোর উদ্ভাস ঘটার প্রতীক। লেখক সুন্দরভাবে এই পরিবর্তনের মুহূর্তটিকে তুলে ধরেছেন—

> "তারপর আস্তে আংটিটা ছেড়ে দিলো দেয়ালে ঝোলানো শার্টের বুকপকেটে। খস করে একটা শব্দ হল সেখানে। তাও কান পেতে শুনল। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। বৃষ্টিটা তখন থেমে গেছে। আর রাহুমুক্ত চাঁদ খল-খলিয়ে হাসছে আকাশে।"[১৩]

এই গল্পে রায়হান মানবিকতার উত্থান এবং আত্মপরিচয়ের সন্ধানকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'জন্মান্তর' কেবল এক ব্যক্তির পকেটমার থেকে একজন মানবিক মানুষের রূপান্তরের গল্প নয়, এক ধরনের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের গল্প, যেখানে এক সাধারণ মানুষ তার মানবিকতার গভীরতায় পৌঁছে যায়।

আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্য ও কেরানীশ্রেণির সংগ্রামকে ঘিরে রচিত একটি প্রতিবাদী রচনা 'পোস্টার' গল্পটি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আমজাদ সাহেব, একজন শহুরে অফিসের ছা-পোষা কেরানী, যার জীবন সংগ্রাম মধ্যবিত্ত শ্রেণির যন্ত্রণার প্রতীক। গল্পের মূল সংকট উদ্ভাসিত হয় যখন আমজাদের বাড়ির দেয়ালে হঠাৎ করেই কিছু পোস্টার সাঁটানো হয়। পোস্টারগুলোর শ্লোগান যেমন— 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'বাঁচার মতো মজুরি চাই'। এগুলো মূলত শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে রচিত। কিন্তু আমজাদ সাহেবের মতো একজন ছা-পোষা কেরানী, যিনি নিজের জীবনযুদ্ধে সারাক্ষণ ব্যস্ত, তিনি এই পোস্টারগুলোর মূল বার্তা ও এর রাজনীতিকে পুরোপুরি বোঝেন না এবং মনে করেন এগুলো রাষ্ট্রবিরোধী এবং অর্থহীন কর্মকাণ্ড। তবে গল্পটি মোড় নেয় তখন, যখন একদিন আমজাদ সাহেব নিজেই চাকরি হারানোর সম্মুখীন হন। অফিসে ছাঁটাইয়ের শিকার হয়ে যখন তিনি নিজের বাড়িতে ফেরেন, তখন জীবনের এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি হন। চাকরি হারানোর পর আমজাদ সাহেবের জীবনে যে ধাক্কা আসে, তা তাকে সমাজের গভীর বাস্তবতা বুঝতে বাধ্য করে। আগে যেসব পোস্টারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন, এখন তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে। তার জীবনের সবচেয়ে বিদ্রূপাত্মক মুহূর্ত আসে যখন তিনি আরেকটি নতুন পোস্টার দেখতে পান তার বাড়ির দেয়ালে, এবং সেই পোস্টারে লেখা ছিল—

> ''ছাঁটাই করা চলবে না।''[১৪]

পোস্টারটি দেখে আমজাদ সাহেব হঠাৎ থমকে যান। যে পোস্টারকেন্দ্রিক রাজনীতিকে এতদিন তিনি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এসেছেন, সেই রাজনীতিই আজ তার পক্ষে কথা বলছে। গল্পটি একটি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। আমজাদ সাহেব, যিনি রাষ্ট্রের পক্ষে সবসময় ছিলেন এবং রাষ্ট্রবিরোধী

আন্দোলনকে অবজ্ঞা করেছেন, সেই রাষ্ট্রই আজ তাকে ছাঁটাই করেছে। তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, যে আন্দোলনকে তিনি অবহেলা করেছেন, তা আসলে তার নিজের মতো মানুষের জন্যই লড়াই করছে। পোস্টার, যা একসময় তার চোখে রাষ্ট্রবিরোধী এবং গুরুত্বহীন ছিল, এখন তার নিজের জীবনের বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।

শহরের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী জীবন ও তাদের মানসিকতার প্রকাশ 'দেমাক' গল্পটি। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিম শেখ একজন বাস ড্রাইভার, যার জীবন কাজের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা ও সম্মানে ভরপুর। তার কাছে কাজ শুধুমাত্র উপার্জনের মাধ্যম নয়, বরং তার আত্মসম্মান ও গর্বের অংশ। গল্পের ভিন্ন চরিত্র রহমত, যিনি জীবিকা নির্বাহ করেন হাত গণনা করে, অর্থাৎ তার আয়ের উৎস এক ধরনের প্রতারণা বা 'লোকঠকানো' উপায়। রহিম শেখের কাছে এ ধরনের আয় হলো 'হারাম'। এই দুই ভিন্ন পেশার মানুষ একে অপরকে সহ্য করতে পারে না এবং তাদের মধ্যে মানসিক বিরোধ স্থাপিত হয়। রহিম শেখ তার কাজের প্রতি গর্বিত, আর রহমত ঈর্ষাকাতর। রহিমের এই আত্মনির্ভরশীলতা রহমতের কাছে অহংকার বা দেমাক হিসেবে ধরা দেয়। কিন্তু রহিম শেখ একটি দুর্ঘটনায় পড়ে চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারায়। এই ঘটনায় রহমত গোপনে খুশি হলেও প্রকাশ্যে সে করুণা দেখায়। তার মনে হয়, রহিম শেখের এই দুর্ঘটনা তার 'দেমাক'-এর পতন। এখন তাকে ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবন কাটাতে হবে। রহিম শেখ, যিনি এতদিন আত্মনির্ভরশীল ছিলেন, এখন আর সেই গর্ব ধরে রাখতে পারবেন না— এমনটাই ভেবেছিল রহমত। তবে রহমতের ভুল ভাঙে একদিন সদরঘাটের মোড়ে, যখন সে দেখে রহিম শেখ পত্রিকা বিক্রি করছে। ভিক্ষার হাত না বাড়িয়ে, নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য সে পত্রিকা বিক্রির কাজ শুরু করেছে। এই দৃশ্য রহমতকে হতবাক করে দেয়। তার মনে হয়েছিল রহিম শেখ অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকবে, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। রহিম শেখ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচতে চেয়েছে, সম্মান নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। তার এই শক্তিশালী মনোভাব এবং আত্মনির্ভরশীলতাকে লেখক দেমাক বলেই চিহ্নিত করেছেন। গল্পকার রহমতের ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এইভাবে—

> "ইস, দেমাকে যেন পা মাটিতে পড়তে চায় না লোকটার।"[১৫]

রহিম শেখের দেমাক, তার গর্ব, তার আত্মসম্মান, তাকে ভিক্ষার হাত পাততে দেয়নি। বরং তিনি পত্রিকা বিক্রির মতো একটি সাধারণ কাজ করেও নিজের গৌরব বজায় রাখতে পেরেছেন। তিনি কখনোই লোকের দয়ায় বাঁচতে চাননি, বরং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। রহিম শেখের এই গর্ব তার চরিত্রের মহত্ত্বকে তুলে ধরে, যা আসলে দেমাক নয়, মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের আত্মসম্মান, জীবনসংগ্রাম, আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীক।

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের গভীরে এক নবচেতনার সঞ্চার করেছিল। এই আন্দোলনের প্রতিফলন শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামে নয়, শিল্প ও সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রসারেও বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। জহির রায়হান ছিলেন সেই চেতনার অন্যতম বিশিষ্ট প্রতিনিধি। ভাষা-আন্দোলন তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রধান অনুপ্রেরণার উৎস ছিল, যা পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রকাশিত হয়েছে। জহির রায়হান ভাষা-আন্দোলনের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তিনি শুধু আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত রাখেননি, বরং এর আবেগ, উত্তেজনা এবং ত্যাগ তাঁর সাহিত্যেও গভীরভাবে স্থান পেয়েছিল। জহির রায়হান ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একাধিক গল্প লিখেছেন, যেখানে আন্দোলনের সংগ্রাম, ত্যাগ, এবং আবেগের সঙ্গে সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিল চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হলো— 'সূর্যগ্রহণ', 'মহামৃত্যু', 'অতি পরিচিত', 'একুশের গল্প', 'একুশে ফেব্রুয়ারি',

'কয়েকটি সংলাপ' এবং অগ্রন্থিত গল্প 'ঢেউ'। 'ঢেউ' গল্পটি ১৯৫৩ সালে 'সওগাত' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, যা ভাষা-আন্দোলনের চেতনার একটি শক্তিশালী প্রতিফলন।

'সূর্যগ্রহণ' একুশে ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপটে রচিত একটি অনন্য ছোটগল্প, যেখানে ভাষা-আন্দোলনের চেতনা এবং সংগ্রামের গভীর প্রকাশ ঘটেছে। 'সূর্যগ্রহণ' রায়হানের প্রথম গল্প, যেখানে ভাষা-আন্দোলনের আবেগ এবং ত্যাগ ফুটে উঠেছে তসলিম নামক চরিত্রের মাধ্যমে। গল্পের কথক আনোয়ার বর্ণনা করেছে তসলিমের জীবনকাহিনী, যে বাইশে ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্টের মোড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হয়েছিল। এই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক ভাষার প্রতি এদেশের মানুষের গভীর মমতা এবং দায়িত্ববোধকে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন। আনোয়ার যখন তসলিমকে বাইশে ফেব্রুয়ারি বাইরে না যেতে বলে, তখন তসলিমের উত্তর ছিল তার গভীর দেশপ্রেমের প্রতিচ্ছবি—

"আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকে তো কবিতা লিখব কী দিয়ে?"[১৬]

এই সংলাপ শুধু ভাষার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ নয়, এটি তসলিমের আত্মত্যাগেরও প্রতীক, বাঙালি জাতির সম্মিলিত সংগ্রামের প্রতিধ্বনি। এই গল্পে রায়হান বাঙালির ভাষা-আন্দোলনের চেতনার সঙ্গে ব্যক্তিজীবন, দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেমের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তসলিমের মতো অসংখ্য বাঙালি, যারা ব্যক্তিগত সংগ্রাম সত্ত্বেও দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছে, তাদের সংগ্রাম এবং মাতৃভাষার প্রতি আনুগত্যের গল্প এটি।

'মহামৃত্যু' ভাষা-আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চেতনাকে ধারণ করে লেখা একটি মর্মস্পর্শী গল্প। ভাষা শুধু একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং তা একটি জাতির আত্মপরিচয়ের মূল ভিত্তি— এই উপলব্ধি গল্পটির প্রতিটি পরতে পরতে বিদ্যমান। গল্পটি একজন তরুণ শহিদকে নিয়ে রচিত, যার নামও প্রতীকীভাবে শহীদ। যদিও গল্পে শহীদের নিজের বক্তব্য অনুপস্থিত, তার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ভাষা-আন্দোলনের গভীর তাৎপর্য ফুটে উঠেছে। শহীদ গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল উচ্চশিক্ষার আশায়। কিন্তু যখন ভাষাআন্দোলনের - উত্তাল সময় এল, তখন শিক্ষিত তরুণদের মতো সেও সেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ পুলিশের গুলিতে মৃত্যু বরণ করে। তার এই মৃত্যু শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত ত্যাগ নয়, এটি জাতির সম্মিলিত আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে ওঠে। গল্পটির বিশেষ দিক হলো, শহীদের মৃত্যুর পরে যে ঘটনাপ্রবাহ ঘটে তা। তার লাশকে ঘিরে সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মজুর, কামার, যুবকযুবতী-, বৃদ্ধবৃদ্ধা-— সবাই সমবেত হয়। শহীদের রক্তাক্ত শার্ট দিয়ে পতাকা তৈরি করা হয়, যা ভাষার জন্য জীবনদানকারী শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগের প্রকাশ। এই ঘটনাটি শুধু ভাষাআন্দোলনের একটি প্রতীকী চিত্রই নয়-, বরং এটি মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেরও চিত্র। গল্পের আরেকটি চরিত্র শমসের আলীর কথায় ভাষাআন্দোলনের - প্রতিসাধারণ মানুষের আবেগ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শমসের আলীর অনুভূতি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সংযোগেরই বহিঃপ্রকাশ—

''বড় হিংসে হচ্ছে— বড় হিংসে হচ্ছে, ফজলুরে, আমি কেন ওর মত মরতে পারলাম না।''[১৭]

শমসেরের এই উক্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে আন্দোলনের প্রতি যে ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা, তারই প্রতিচ্ছবি।

জহির রায়হান ভাষাআন্দোলন বিরো-ধী কিছু মানুষের মানসিকতা এবং তাদের আচরণের চিত্র তুলে ধরার জন্য রূপকের আশ্রয় নিয়েছে 'অতি পরিচিত' গল্পে। গল্পের মূল চরিত্র আসলাম একজন দেশপ্রেমিক, যিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করার জন্য প্রাণপণ লড়াই করছেন। কিন্তু নায়িকা ট্রলির পরিবার বিশেষ করে তার বাবা, পশ্চিম পাকিস্তানের তাবেদারি করে এবং ভাষাআন্দোলনের বিরোধিতা -

করে। ট্রলিও তার বাবার মতো চিন্তাভাবনা পোষণ করে, যা গল্পের দ্বন্দ্বের মূল সূত্র। গল্পে ট্রলির বাবা ভাষা আন্দোলনকারীদের-ব্যঙ্গ করে, একে ইসলাম-বিরোধী আখ্যা দেয়। তার মতে, বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করা একটি ''কুফুরি'' কাজ। ট্রলির বাবার উক্তিতে ধরা পড়েছে বাংলা-বিরোধী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ও তাদের সমর্থকদের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা—

> "এদেশের ছেলেমেয়েগুলো সব গোল্লায় গেছে। উচ্ছন্নে গেছে সব। নইলে ইসলামি ভাষা ছেড়ে দিয়ে এই কুফুরি ভাষার জন্য এত মাতামাতি কেন?"[১৭]

এই গল্পটি মূলত ভাষাআন্দোলনের বিরোধীদের এবং তাদের আত্মপরিচয়ের সংকটকে তুলে - ধরেছে। ট্রলির পরিবার রূপক হয়ে দাঁড়ায় সেসব মানুষের, যারা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির তুলনায় রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী চিন্তাভাবনাকে সমর্থন করে। এভাবে গল্পটি একদিকে ভাষাআন্দোলনের চেতনা - আর অন্যদিকে তার বিরোধিতাকারী কিছু মানুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছে।

ভাষাআন্দোলনের পটভূমিতে রচিত একটি সার্থক প্রতীকধর্মী গল্প- 'একুশের গল্প', যেখানে তপুর আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে ভাষার প্রতি বাঙালির গভীর ভালবাসা এবং দেশপ্রেমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গল্পটি বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে ভাষার গুরুত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। গল্পে চার বছর আগে ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঘটে যাওয়া তপুর মৃত্যুকে প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তপু, ভাষাআন্দোলনে শ-হিদ হওয়া একজন তরুণ, যার আত্মত্যাগ শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং বৃহত্তর স্বার্থের জন্য, জাতির মঙ্গলের জন্য। সে তার মা, হবু স্ত্রী রেনু এবং পারিবারিক দায়িত্বের চেয়েও মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। লেখক অত্যন্ত আবেগপূর্ণভাবে তপুর আত্মত্যাগের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। তপু মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে, তার কপালের মাঝখানে গুলির ক্ষতচিহ্ন থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। লেখকের ভাষায়—

> ''কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল একটা গর্ত। আর সে গর্ত নিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার।''[১৮]

এই দৃশ্যটি শুধু তপুর মৃত্যু নয়, পুরো ভাষাআন্দোলনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তপুর মৃত্যু বাংলা ভাষার - মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালির সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের একটি প্রতিচ্ছবি ওঠে। তার লাশ আজিমপুর গোরস্থানে কবর দেওয়া হলেও, চার বছর পর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার সময় সে কঙ্কাল হয়ে ফিরে আসে রুমমেট মেডিক্যাল ছাত্র রাহাতের ঘরে। এই ফিরে আসা বাস্তবতার নয়, বরং প্রতীকী— একটি জাতির আত্মপরিচয়, ভাষা, এবং স্বাধীনতার জন্য যে অমর সংগ্রাম তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। তপুর কঙ্কালের মাথার ক্ষতচিহ্ন দেখে রাহাত এবং তার মেসের ডাক্তার বন্ধুরা বুঝতে পারে এটি তপুরই কঙ্কাল। লেখক তপুর কঙ্কালকে কেন্দ্র করেই ভাষাআন্দোলনের উত্তাপ-, সেই সংগ্রামের ভয়াবহতা এবং বাঙালির ভাষাপ্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন-

'ঢেউ' গল্পটি ভাষা-আন্দোলন ও বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসার একটি অনন্য উদাহরণ। রিজিয়া চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সেই সময়ের সমাজের উর্দুভাষী সংস্কৃতির প্রভাব এবং তার মধ্যেও বাংলা ভাষার প্রতি একজন মানুষের ভালোবাসার উন্মেষকে তুলে ধরেছেন। রিজিয়া, যে উর্দু সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়েছে, সেও বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও অবদান অস্বীকার করতে পারে না। সময়ের প্রয়োজনে, তার মধ্যেও বাংলার প্রতি ভালোবাসা জেগে ওঠে এবং সে নিজের ইচ্ছায় বাংলা শেখা শুরু করে তার বান্ধবী সেলিনার কাছ থেকে। রিজিয়ার ভাষা-আন্দোলনের প্রতি এই নতুন জন্ম নেওয়া ভালোবাসা এবং সচেতনতার প্রতিফলন ঘটেছে তার একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের প্রস্তুতিতে। সে নিজের হাতে একটি ব্যাজ তৈরি করে, যার মধ্যে ভাষা-আন্দোলনের চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। সেই ব্যাজ পরে সেলিনার দাদা

সালাম নামে আরেক চরিত্র প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহণ করে, যা বাংলা ভাষার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

জহির রায়হানের কয়েকটি গল্পে মুসলমান সমাজের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য, ধর্মীয় কুসংস্কার, নারী জীবনের দুর্দশা প্রাঞ্জলভাবে উপস্থিত হয়েছে। এরকম একটি গল্প হল 'বাঁধ'। গল্পটি গ্রামীণ জীবন, ধর্মীয় অনুভূতি এবং পীর-দরবেশদের প্রভাব নিয়ে রচিত একটি সমালোচনামূলক আখ্যান। এ গল্পের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের নামে প্রতারণার শিকার হয় এবং বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বর্ষাকালে বন্যার সময় পীরের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি তাদের অন্ধবিশ্বাস আরও প্রকট হয়ে ওঠে। গল্পের প্রেক্ষাপট একটি গ্রাম, যেখানে বর্ষা ঋতুতে বন্যা শুরু হয় এবং গ্রামের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের ফসল ও জীবন রক্ষার জন্য পীরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে সেই পীর তাদের বাস্তবিক কোনো সাহায্য করতে অক্ষম। যদিও পীর সাহেব তাদের আশ্বাস দেন যে, তার অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে গ্রামের সবাই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। এতে করে গ্রামবাসী আরও গভীরভাবে তার প্রতি অনুগত এবং বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, গ্রামের কিছু পরিশ্রমী মানুষ, বিশেষত মতি মাস্টার, পীরের বুজরুকিতে বিশ্বাস না করে নিজেদের প্রচেষ্টায় বাঁধটি মেরামত করার উদ্যোগ নেয়। তারা নিজেদের শেষ সম্বল বাঁচানোর জন্য বৃষ্টিতে ভিজে কঠিন শ্রম দিয়ে বাঁধ মেরামত করে, যার ফলে বন্যা থেকে তাদের ফসল ও গ্রাম রক্ষা পায়। মতি মাস্টার শিক্ষিত, বাস্তববাদী এবং সচেতন এক মানুষ। তার বুদ্ধিতেই বাঁধ মেরামত করা সম্ভব হয়। কিন্তু গ্রামের নিরক্ষর ও সরল মানুষগুলোর বিশ্বাস— পীরের অলৌকিক ক্ষমতার কারণেই তারা রক্ষা পেয়েছে। গল্পের চূড়ান্ত অংশে লেখক পীরের প্রতি গ্রামের মানুষের অন্ধবিশ্বাসের প্রতিফলন ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে—

> ''এক মুহূর্তে যেন ভাঙা হয়ে উঠেছে সমস্ত গাঁ-টা। ছেলে-বুড়ো সবাই হুমড়ি খেয়ে খেয়ে আসছে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খাবার জন্যে।''[১৯]

গল্পটি শুধুমাত্র গ্রামীণ জীবনের একাংশ নয়, বরং সমাজের ধর্মীয় ও বাস্তবিক দ্বন্দ্বকেও তীব্রভাবে প্রতিফলিত করেছে, যেখানে প্রচলিত কুসংস্কার এবং বাস্তবতার মধ্যে সংঘাত চিত্রিত হয়েছে।

পীরপ্রথা, কুসংস্কার, ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষ্ঠুরতা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে 'অপরাধ' গল্পে। এই গল্পের মূল চরিত্র সালেহা, যে বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজের নিষ্পেষিত নারী সমাজের প্রতিনিধি। গল্পে পীরপ্রথা শুধু ধর্মীয় শোষণের একটি রূপ নয়, বরং নারীদের প্রতি সমাজের নির্মম আচরণ এবং তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলারও প্রতিফলন। সালেহাকে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তার বাবা আশি বছরের এক পীরের সঙ্গে বিবাহ দেন। এই বিবাহের মধ্যে ধর্মের নামে যে শোষণ ও অত্যাচার চলে, তাই গল্পের মূল থিম। চার বছরের বিবাহিত জীবনে সালেহা তার স্বামীর কাছ থেকে কোনো স্বাভাবিক দাম্পত্য সুখ পায়নি। বরং সে একটি বন্দিজীবন যাপন করেছে, যেখানে তার স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। লেখক তার বদ্ধ জীবনকে তুলে ধরতে গিয়ে জানাচ্ছেন—

> ''কারাগার। এ চারটে বছর ঠিক যেন কারাগারের ভিতরই দিন কাটিয়েছে সে। এতটুকু স্বাধীনতা নেই, নেই নিজের ইচ্ছামতো চলাফেরা করার এতটুকু অধিকার।''[২০]

পীর সাহেবের সঙ্গে বিবাহের মাধ্যমে সালেহার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ধর্মের নামে এই প্রথা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে হরণ করে না, বরং নারীর অধিকার এবং মর্যাদাকেও পদদলিত করে। এই নির্যাতন এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে সালেহা একসময় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং ঘর ছেড়ে পালায়। কিন্তু পীরের হাত থেকে মুক্তি পেলেও, বাবার হাত থেকে সে মুক্তি পায়নি। বাবার প্রহারে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

সালেহার এই মৃত্যুর জন্য সমাজ সালেহাকেই দায়ী করে। তার শ্বশুর বাড়ি থেকে পালিয়ে আসাকেই এই সমাজ 'অপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করে, যা প্রকৃতপক্ষে সমাজের গভীর কুসংস্কার এবং ধর্মীয় ভণ্ডামির চরম দৃষ্টান্ত। সালেহার মর্মান্তিক পরিণতি কেবলমাত্র একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক ব্যাধি এবং নারীর প্রতি সমাজের উপেক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গির চিত্রায়ণ। লেখক ব্যঙ্গাত্মকভাবে এই গল্পের নাম দিয়েছেন 'অপরাধ', যেখানে প্রকৃত অপরাধ সমাজের এবং সেইসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতিনীতির, যা ধর্মের নামে নারীদের শাসন করে, শোষণ করে।

জহির রায়হানের 'কতগুলো কুকুরের আর্তনাদ' গল্পটি একটি তীব্র প্রতীকীধর্মী গল্প, যেখানে সমাজের লোভী, স্বার্থপর, এবং ক্ষমতালোভী ব্যক্তিদের কুকুরের প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। গল্পে কুকুরগুলো আসলে ভদ্রলোকদের প্রতিচ্ছবি, যারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত। এ ধরনের লোকেরা সামাজিক অবস্থান ও পেশার দোহাই দিয়ে নিজেদের উচ্চবিত্ত বলে দাবি করলেও, তাদের মধ্যে নৈতিকতা এবং বিবেকবোধের অভাব প্রকট। লেখক সমাজের এই শ্রেণিকে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

> ''স্কুল। পাঠশালা। অফিস। আদালত। সর্বত্র কুকুরে কুকুরময়। সবাই গলা ছেড়ে চিৎকার করছে।''[২১]

এখানে স্কুল, অফিস, এবং আদালত হলো প্রতীক, যা শিক্ষিত, দায়িত্ববান এবং ক্ষমতাবান শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, এসব স্থানেও স্বার্থপরতা এবং লোভ বাসা বেঁধেছে, এবং কুকুরের মতো আচরণ করে মানুষ একে অপরকে কামড়ে ধরছে। গল্পটি বাস্তবতার প্রতিফলন এবং ক্ষমতালোভী শ্রেণির প্রতি তীর্যক সমালোচনা। মানুষ যে নিজের স্বার্থের জন্য নৈতিকতা বিসর্জন দিতে পারে, তা গল্পে প্রতীকী চিত্রায়নের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং এর পরিণতির ওপর গভীর আলোকপাত করা হয়েছে 'ম্যাসাকার' গল্পে। গল্পের কথক ডা: চৌধুরী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে গিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে এবং নারীর ওপর নিগ্রহ চালিয়েছে। গল্পের মূল চরিত্রগুলোর মধ্যে ষোল বছরের কিশোর জর্জ, প্রেমিক যুবক এডওয়ার্ড এবং লুইসা— এই তিনজনই যুদ্ধের শিকার। জর্জ তার মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারেনি, এডওয়ার্ড আত্মহত্যা করেছে এবং লুইসা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার মাধ্যমে লেখক যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা এবং মানুষের দুর্দশা তুলে ধরেছেন। এছাড়া, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ওপরেও প্রভাব ফেলেছে। লেখক তুলে ধরেছেন যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত দুর্ভিক্ষ, অভাব, মহামারী ও মৃত্যুর ভয়াবহ চিত্র, যা পাঠকের মনে গভীর দাগ কাটে। তিনি বলেছেন—

> "দ্বিতীয় মহাসময়। আর দুর্ভিক্ষ জর্জরিত সোনার বাংলা, চারিদিকে শুধু হাহাকার, অন্ন নেই। বস্ত্র নেই। নেই! নেই! কিছু নেই! আছে শুধু দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর অভাব অনটন।"[২২]

ডা: চৌধুরীর ভিতরে জমে থাকা ক্ষোভ এবং দুঃখ একসময় প্রতিবাদের ভাষায় পরিণত হয়। তিনি মেজর কলিনসকে থাপ্পড় মারেন, যা তার নিজের প্রতিবাদের প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর এই অভিজ্ঞতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানবতার পক্ষে এক শক্তিশালী বার্তা হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ জহির রায়হান ম্যাসাকার গল্পে একটি নির্দিষ্ট সময়কে ধরতে চেয়েছেন। ম্যাসাকার গল্পটি যখন লেখেন, তখন তিনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। ছাত্রজীবনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাত একজন তরুণ ছাত্রের মনে যে চিন্তার আলোড়ন তুলেছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ 'ম্যাসাকার'।

তাঁর গল্পগুলি আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, জহির রায়হান বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পাকিস্তানি শাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ এবং নবীন উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয় মানসের বিকাশ তাঁর সাহিত্যকে এক বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাহান্ন থেকে একাত্তর— প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রভাগে, তাঁর সাহসী পদচারণা সব সময় দেশপ্রেমে উজ্জীবিত ছিল। জহির রায়হানের সাহিত্যকর্মে রাজনীতির উপস্থিতি এতটাই দৃঢ় যে, সমকালীন অনেক লেখকের মধ্যে তার অভাব দেখা যায়। তিনি কেবল দেশীয় ঘটনাবলীতে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং বৈশ্বিক আন্দোলন ও সংগ্রামের বাস্তবতা নিয়েও লিখেছেন, যেমন তাঁর 'ম্যাসাকার' গল্পে। তিনি মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, যা তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। এভাবে তিনি রোমান্টিক ও আবেগধর্মী জীবনদৃষ্টি থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তাঁর গল্পে সমকালীন বৈরী পরিবেশ, সমাজের অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ এবং জাতি-শ্রেণী ও ধর্মের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পাশাপাশি বিশ্বমানবতার বোধ ও গণচেতনার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, যা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সূত্রনির্দেশ:

১. শাহরিয়ার কবির, 'ভূমিকা', একুশে ফেব্রুয়ারি, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৬।
২. জহির রায়হান, 'হারানো বলয়', জহির রায়হান রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), ড. আশরাফ সিদ্দিকী (সম্পা.), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১০, পৃ. ১০৯।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।
৬. জহির রায়হান, 'নয়া পত্তন', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২।
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।
১০. জহির রায়হান, 'ভাঙাচোরা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬।
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬।
১২. জহির রায়হান, 'জন্মান্তর', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।
১৪. জহির রায়হান, 'পোস্টার', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯।
১৫. জহির রায়হান, 'দেমাক', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭।
১৬. জহির রায়হান, 'সূর্যগ্রহণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।
১৭. জহির রায়হান, 'অতি পরিচিত', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।
১৮. জহির রায়হান, 'একুশের গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩।
১৯. জহির রায়হান, 'বাঁধ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।

২০. জহির রায়হান, ‘অপরাধ’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭।
২১. জহির রায়হান, ‘কতগুলো কুকুরের আর্তনাদ’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩।
২২. জহির রায়হান, ‘ম্যাসাকার’, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩।